দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 3 OCT 2002 পৃষ্ঠা ১৩

শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষকদের দায়িত্ব

ভিন্ন ভাবনা

বোরহান আহমেদ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কোন আলোচনা হলেই আমার মানসপটে ভেসে ওঠে বেশ কিছু স্কুল-কলেজের প্রতিচ্ছবি। ভেসে ওঠে অনেক আত্মত্যাগী মানুষের চেহারা। কত মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নিজের শ্রমে অর্জিত অর্থ ব্যয় করে শিক্ষার আলোকবর্তিকা ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে একেক মহৎ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একেকটি স্কুল-কলেজ। কত স্বপ্ন ছিল তাঁদের। তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া শিখে কত ছাত্রছাত্রী দেশবরেণ্য হবে! জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কেউ কেউ মহান অবদান রাখবে। মানবসেবায় অনেকে উৎসর্গ করবে জীবন। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এখন কি হাল? এখানে কি সত্যি পড়াশোনা হয়? শিক্ষকরা কি সত্যি আন্তরিকতার সাথে ছাত্রছাত্রীদের পড়ান? পরীক্ষার ফল কেন খারাপ হয়? নকল হয়-কেন? এমনি হাজারো প্রশ্ন প্রকৃত শিক্ষানুরাগীর। প্রশ্ন জাগে, শিক্ষকরা কি সত্যি মানুষ গড়ার কারিগর--না, শিক্ষক নামধারী কতিপয় ব্যক্তি শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ বিনষ্টের হোতা? ক'দিন আগে একটি জেলা শহরের মহিলা কলেজের দুর্নীতি সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত খবর দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। ভাবছিলাম, একজন অধ্যক্ষ এত নিষ্ঠুর, দুর্নীতিবাজ ও শিক্ষার প্রতি উদাসীন হন কিভাবে? যেনতেনভাবে অর্থ উপার্জনই যদি জীবনের লক্ষ্য হয়, তবে তাঁরা কেন শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করেন? অনেক কৌতূহল নিয়ে কলেজটি দেখতে গিয়েছিলাম কয়েকবার, কিন্তু অধ্যক্ষের দেখা পাইনি। তিনি কখন আসেন আর কখন চলে যান তা কেউ বলতে পারেন না। ঢাকা থেকে এসে কলেজ করেন। সেখানে থাকেন না। তিন শ' ছাত্রীর স্বাক্ষরযুক্ত একটি স্মারকলিপি হাতে এসেছিল।

স্মারকলিপি পড়ে মনে হয়েছিল কলেজটিতে এখন আর লেখাপড়ার তেমন কোন পরিবেশ নেই। দুর্নীতির ভারে যেন ভারাক্রান্ত। ছাত্রীদের নিকট থেকে প্রতিমাসে অনেক রকম ফী নেয়া হয়; কিন্তু তা কলেজ ফান্ডে জমা হয় না। তা কোথায় যায় তা অধ্যক্ষ জানেন, কিন্তু কিছু বলেন না। কলেজের একটি বড় পুকুর আছে। মাছ চাষ হয় তাতে। বছরে ৪০ হাজার টাকা আয় হয়েছে। কিন্তু কলেজ ফান্ডে জমা হয়েছে মাত্র আড়াই হাজার টাকা। এমনি হাজারো বেহিসাবী কর্মকাণ্ড চলছে সেখানে।

অতি সম্প্রতি প্রফেসর ও ছাত্রীদের প্রতি দেয়া এক নির্দেশে সমগ্র কলেজে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্রীদের সকাল ৯টায় কলেজে আসতে হবে এবং ৪টা পর্যন্ত প্রত্যেককে কলেজে থাকতে হবে। ৪টার আগে কেউ কলেজ থেকে বের হতে পারবে না। বিক্ষুব্ধ শিক্ষক ও ছাত্রীদের প্রশ্ন, কিভাবে তারা সময় কাটাবে? কলেজে কমনরুম নেই, নেই রিক্রিয়েশনের কোন ব্যবস্থা, ক্যান্টিন নেই। নামকা ওয়াস্তে যে লাইব্রেরি আছে তাতে বই নেই। এমনকি টয়লেটের ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। কলেজটা যেন একটা 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে' পরিণত হয়েছে। এমনি পরিস্থিতিতে প্রায়ই ছাত্রীরা কলেজে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কলেজে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। নেই 'ফার্স্ট এইডের' সরঞ্জাম।

আর একটি স্কুলের কথা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। এটিও মেয়েদের শিক্ষাঙ্গন। প্রায় বছর পাঁচেক আগে কয়েক তরুণ নিভৃত এক পল্লীতে মেয়েদের জন্য স্কুলটি চালু করেছিল। দারুণ প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই স্কুলটির পড়াশোনা চলছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যসূচীও চালু হয়েছে সেখানে। স্কুলটিকে ঘিরে সমগ্র এলাকায় উন্নয়নের প্রেরণা দেখা দিয়েছে। বিদ্যুত এসেছে, রাস্তা পাকা হয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই আধুনিক যুগেও মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকে চায় না। তারা স্কুলটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল। অনেক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে স্কুলটি আবার মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু স্কুলের স্থানীয় এক ধর্মশিক্ষকের সহায়তায় গ্রামের কতিপয় অসামাজিক ব্যক্তি স্কুলটি বন্ধ করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। নানা রকম ষড়যন্ত্র চলছে স্কুলের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন স্থানে মিথ্যা অভিযোগ জানিয়ে চিঠি দেয়া হচ্ছে। মেয়েদের লেখাপড়া না শিখিয়ে তাদের দিয়ে আন্দোলনের উস্কানি দেয়া হচ্ছে। শিক্ষকদের বেতন ও সুযোগ বৃদ্ধির জন্য মেয়েদের দিয়ে স্মারকলিপি দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে। এখনও সেই ধর্মশিক্ষক ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা স্কুলে সন্ত্রাসীর ভূমিকা পালন করে চলেছে। উর্ধতন কর্তপক্ষের বিরুদ্ধে অবাধ্য আচরণ করছে। সমগ্র স্কুলে সৃষ্টি করেছে অশান্ত উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশ।

আজ এমনি অবস্থা বিরাজ করছে দেশের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। জেলা শহর পর্যায়ে কোন কোন স্কুলে পড়াশোনা হচ্ছে। নিয়মশৃঙ্খলা মোতাবেক ছাত্র-শিক্ষকরা লেখাপড়ার পরিবেশ বজায় রেখেছে। কিন্তু উপজেলা বা ইউনিয়নভিত্তিক বেসরকারী স্কুলগুলোতে বিরাজ করছে এক ভয়াবহ অরাজক পরিস্থিতি। প্রায় প্রত্যেকটি স্কুলে চলছে শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ। কেউ কাউকে মানেন না। তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা, শিক্ষকদের চাকরি 'কেউই' খেতে পারে না। তাই তাঁদের সীমাহীন ঔদ্ধত্য সমগ্র বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে দিচ্ছে। এছাড়া অনেক স্কুলে ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে শিক্ষকদের মতবিরোধ রয়েছে। কোথাও কোথাও প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে ম্যানেজিং কমিটির সম্পর্কও স্বাভাবিক না থাকার ফলে স্কুলে সৃষ্টি হচ্ছে সঙ্কট। এছাড়া অতি নগণ্য ইস্যুতে কোন কোন স্কুলে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে যখন তখন ধর্মঘট পালন করা হচ্ছে। কখনও গ্রামের দু'একজন অসামাজিক ব্যক্তিও স্কুলের ফাঁকিবাজ শিক্ষকদের সহায়তায় এ ধরনের বহু অপকীর্তিতে লিপ্ত হচ্ছে। গ্রামের নোংরা 'পলিটিক্সের' শিকার হচ্ছে স্কুল-কলেজ।

সম্প্রতি বিয়ামে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনাসভায় জেলা পর্যায়ের ১৭০ প্রধান শিক্ষকসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সেমিনারে খোলামেলা আলোচনায় অনেক বিষয় প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষক, মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের পিয়ন থেকে পদস্থ কর্মকর্তাদের দুর্নীতির বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। আলোচিত হয়েছে ফ্যাসিলিটিজ আর শিক্ষা ভবনের নৈরাজ্যের কথা। গ্রাম পর্যায়ের স্কুলগুলোর সঠিক চিত্র সর্বসমক্ষে তুলে ধরা হয়েছে। অনেক শিক্ষক স্কুলেই প্রাইভেট পড়ান--ক্লাসে পড়ান না। নকলের জন্য অনেক শিক্ষক উৎসাহ দেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকরাই ছাত্রদের নকল সরবরাহ করেন। অনেকে পরীক্ষার খাতায় লিখে দিতেও কসুর করেন না। এই হচ্ছে গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তব চিত্র। এ অবস্থায় উপবৃত্তি অথবা যে কোন সুযোগ-সুবিধাই দেয়া হোক না কেন, তাতে কোন লাভ হবে না। দুর্নীতি বাড়বে। বাড়বে শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল। স্কুলে পড়াশোনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে পড়াশোনা হবে না। পড়াশোনার জন্য প্রয়োজন ভাল শিক্ষক। সন্ত্রাসী মনোভাবাপন্ন শিক্ষকদের শিক্ষাঙ্গনে কোন স্থান হওয়া উচিত নয়। কোন্দলমুক্ত রাখতে হবে স্কুলগুলো। শিক্ষকদের জবাবদিহিতা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা জোরদার করতে না পারলে শিক্ষকরা কখনই সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করবেন না। সন্ত্রাসী ও দুর্নীতি মনোভাবাপন্ন শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে তাদের শিক্ষকতা পেশা থেকে বহিষ্কার করা যেতে পারে। প্রত্যেক উপজেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা আছেন, শিক্ষা অফিসার আছেন। প্রশ্ন ওঠে, তাঁরা কি আদৌ তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করেন? শিক্ষকদের অনেক পেশাগত সংগঠন আছে--আছে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, স্কুল-কলেজ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ ফেডারেল শিক্ষক সমিতিসহ বেশ কিছু সংগঠন। এসব সংগঠনের নেতারা তাঁদের রুটি রুজির জন্য সংগ্রাম করেন, ধর্মঘট, কর্মবিরতিসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী পালন করেন। কিন্তু তাঁরা কি কখনও শিক্ষার মান উন্নয়নে অথবা নকলমুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন? এটা কি তাঁদের দায়িত্ব নয়? তাঁরা কি দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, ফাঁকিবাজ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সোচ্চার হয়েছেন কখনও? না, শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন?

শিক্ষাঙ্গনের এই নৈরাজ্যের জন্য শুধু বিত্তবানরাই নয় মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদেরও পড়াশোনার জন্য বিদেশে পাঠানো হচ্ছে। বাংলাদেশের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এখন ভারত, ব্রিটেন, আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা করছে। হিসাব নিয়ে জানা যায় এজন্য প্রতিবছর প্রায় এক হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি ও শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব শিক্ষক, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তার। কেউ একক দায়িত্ব নিলে কোন সুফল পাওয়া যাবে না। বরং তাতে দুর্নীতি বাড়বে শুধু। গণশিক্ষা চালু করা হয়েছে বেশ ক'বছর আগে। তাতে লাভ কতটুকু হয়েছে তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষার ফলাফলও বিশ্লেষণ করা দরকার। আজকের উপবৃত্তির সুফল সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাঙ্গন পরিচালনার সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁরা যদি সৎ, নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক না হন, তা হলে এসব উদ্যোগ সফল হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এ জন্য প্রয়োজন কঠোর ব্যবস্থাপনা। অন্যথায় সমগ্র জাতির ওপর নেমে আসবে ভয়াবহ বিপর্যয়।